দৈনিক বজ্রশক্তি
Dainik Bajroshakti

সংকলন

রেজি: ডি এ ৬২৬৯, সংখ্যা -০৮ ।
পৌষ ১৪২২ । ডিসেম্বর ২০১৫ ।
শাওয়াল ১৪৩৬ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের
কবলে বাংলাদেশ

দেশকে নিরাপদ রাখার জন্য
ঐক্যের বিকল্প নেই
-হেযবুত তওহীদ

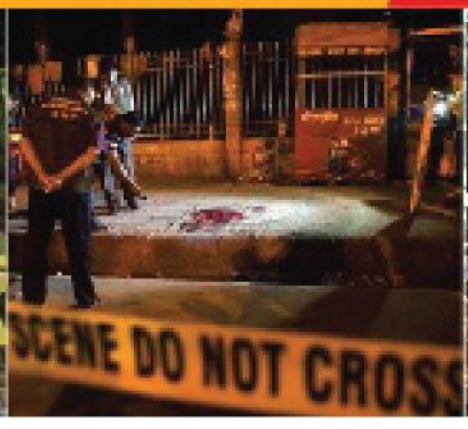

সম্পাদকীয়

ঝুঁকিতে মানচিত্র
মুক্তির পথ ধর্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেমের সদ্ব্যবহার

ফ্রান্সের খ্যাতনামা সাংবাদিক, লেখক ও চিত্রশিল্পী বেন নর্টন তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশেষণ করেছেন প্যারিসের সন্ত্রাসী ঘটনা ও তার অভিঘাত। salon.com-এ প্রকাশিত তার এই লেখায় তিনি স্পষ্টত বলেছিলেন, "ব্রিটিশরা উনিশ শতকে ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ও মিশর দখল করার পর সেখানে মিথ্যাবাদী সরকার বসিয়েছিল। পাশবিক পুলিস বাহিনী গঠন করেছিল, মিথ্যুক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর ভুয়া নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল।" এটাই ছিল ব্রিটিশদের এই জাতিকে বিনাশের প্রথম পদক্ষেপ। এবং তার পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সেখানে কি হয়েছে সচেতন পাঠকবর্গের পরিষ্কার ধারণা আছে-

১. আরবকে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে। শিয়া সুন্নি দ্বন্দ্বকে আরো বহুগুণ উস্কে দেয়া হয়েছে। আরো বহু ধরনের মতবাদ সেখানে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা হল ডিভাইড অ্যান্ড রুল ষড়যন্ত্র।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অক্ষ শক্তি এবং মিত্র শক্তি মিলে সমস্ত বিশ্বটাকে সন্ত্রাসের তাণ্ডবের লীলাভূমিতে পরিণত করেছিল। দুইটি বিশ্বযুদ্ধে তারা তেরো কোটি বনী আদমকে হত্যা করেও সভ্যজাতির মুখোস পরে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে হিরোশিমা, নাগাসাকিকে পারমাণবিক বোমা ফেলে দুই দিনে ২ লক্ষ ২০ হাজার বেসামরিক মানুষ তারা হত্যা করে পুরো পৃথিবী ও মানবজাতির অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করে। যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ আহত বিকলাঙ্গ হওয়ার পর, হাজার হাজার নগর বন্দর ধূলিস্মাৎ করে দেওয়ার পরও তারা মানবতার অবতার সেজে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে বিশ্বকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ধোঁকা বেশিদিন টিকে নাই। দীর্ঘদিন থেকে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক বক এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বক - দুই বকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর অবশেষে ভিয়েতনামে এসে আমেরিকা চরমভাবে পরাজিত হয়। আমেরিকা মূলত ব্রিটেনেরই সম্প্রসারিত রূপ। কী অসম্ভব বুদ্ধি! তারিফ করতে হয়

সূচিপত্র

- *জঙ্গিবাদ নির্মূলের সঠিক আদর্শ-৩*
- *সকলেই চান জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধতা এবং জনসচেতনতা, কিন্তু কী কথা দিয়ে?-১১*
- *দেশকে রক্ষা করতে জনগণের কর্তব্য-১৩*
- *সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে-১৬*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

তাদের। কারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগটি তারা পেয়ে যায় আফগানিস্তানে এবং সেখানে মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসকে নিজেদের পক্ষে এবং কম্যুনিস্ট বকের বিরুদ্ধে সুকৌশলে তারা ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। তারা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ফতোয়াবাজ মোলাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ তরুণকে ধারণা দেয় যে, আফগান যুদ্ধ হচ্ছে আলাহর রাস্তায় জেহাদ। এতে অংশ নেওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ। কিন্তু কথাটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটি ছিল আমেরিকা রাশিয়ার স্বার্থের দ্বন্দ্বমাত্র। যুদ্ধ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আফগানিস্তানের মাটি। ধর্মচেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে মাটির সাথে মিশে গেল কিন্তু ইসলামের কী লাভ হলো, আলাহ রসুলের কী লাভ হলো? কোনোই লাভ হলো না। কারণ ইসলামের নামে জন্ম নিল এক ভয়াবহ অনৈসলামিক উগ্রপন্থা যার নাম জঙ্গিবাদ। সেই যে জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করল আজকে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় সেই আগুন জ্বলছে। তাদের অপকর্মের দায় মুসলিম জাতি ও ইসলাম ধর্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে দমন করার নামে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলিমকে হত্যা করে ফেলাটাও বৈধ বলে মনে করা হচ্ছে। এ নিয়ে বিশ্ব এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখী।

সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত এবং মতবাদের সংঘাত বর্তমানে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে আমাদের এক চিলতে মাটি, আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি, ১৯৭১ সালে যা আমরা লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে লাভ করেছিলাম, এখন সেই দেশ হুমকির মুখে পড়েছে। নতুন করে এই দেশটাকে গ্রাস করার জন্য দেশে-বিদেশে যে ষড়যন্ত্র চলছে, আলাহ না করেন যদি কোনোভাবে এ দেশ আক্রান্ত হয় তাহলে আমাদের যাওয়ার আর জায়গা থাকবে না। আমরা ষোল কোটি মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার কেউ নেই। সিরিয়ার মুসলমানদের ভাগ্যে আমরা যে পরিণতি দেখতে পাচ্ছি, মেসেডোনিয়ার সীমান্তে বলকান এলাকায় তুষারপাতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রিফিউজি, নারী, শিশু অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করছে, হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছে, খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই, সবাই তাদেরকে ঘৃণা করছে। এই ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। তারা যেসব দেশে ঠাঁই পেয়েছিল সেখানেও এখন আর তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না। তারা হাজারে হাজারে মরছে। নারীদের দুর্দশা কোনো অন্ত নেই। বহু মুসলিম তরুণী জীবন রক্ষার জন্য পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হচ্ছে, একটু আশ্রয়ের জন্য খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে বহু মানুষ। সন্তানকে কোলে পিঠে নিয়ে শত সহস্র মাইল পথ পাড়ি দিচ্ছে মানুষ। গতকালও যাদের সব ছিল, বাড়ি, গাড়ি, চাকরি, ব্যবসা আজ তারা সর্বহারা।

এই অবস্থার দিকেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশও। এ দেশটিকে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র বলে প্রমাণ করার জন্য প্রতিনিয়ত চলছে গুপ্তহত্যা, নাশকতা। অবস্থাপন্নরা ইতোমধ্যেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছেন। আমাদের চতুর্দিকে কাটাতার বেষ্টিত এবং চলছে নিচ্ছিদ্র প্রহরা। পার্শ্ববর্তী মায়ানমারে মুসলিম বিদ্বেষ ভয়াবহ, সেখান থেকে রোহিঙ্গারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বিভিন্ন দেশে সিরিয়ানদের মতোই দুর্দশায় আছে। তাই সেরকম পরিস্থিতি হলে আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাই এখনও সময় আছে এই এক টুকরো মাটিকে আমাদের বুকে আগলে রাখতে হবে। এটাই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এখানে আমাদের পূর্ব পুরুষের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। এটাকে এখন যাবতীয় হায়নার কবল থেকে রক্ষা করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন না করলে আজকে ইরাকের মায়েরা যেমন সন্তানহারা, সন্তানেরা যেমন এতিম তেমনি অবস্থা আমাদেরও হবে। যারা ধর্মীয় দায়িত্ব শব্দটি শুনতে অপছন্দ বোধ করেন তারা দেশপ্রেম, পরিবারের সুরক্ষা বা সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে হলেও এখন ঐক্যবদ্ধ হোন।

ঈমানী দায়িত্ব বা দেশের প্রতি কর্তব্য বা অস্তিত্বের লড়াই যে কারণেই হোক এখন আমাদের ষোল কোটি মানুষকে ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এ সংকলনটি আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ থেকে পাঠক আসন্ন মহা সংকট থেকে পরিত্রাণের পথও উপলব্ধি করতে পারবেন। আশা করব সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মিডিয়া কর্মীসহ সচেতন সকলেই পরিস্থিতির গুরুত্ব জাতির সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হবেন।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুক্তি ও দলিল দ্বারা
আদর্শিক লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

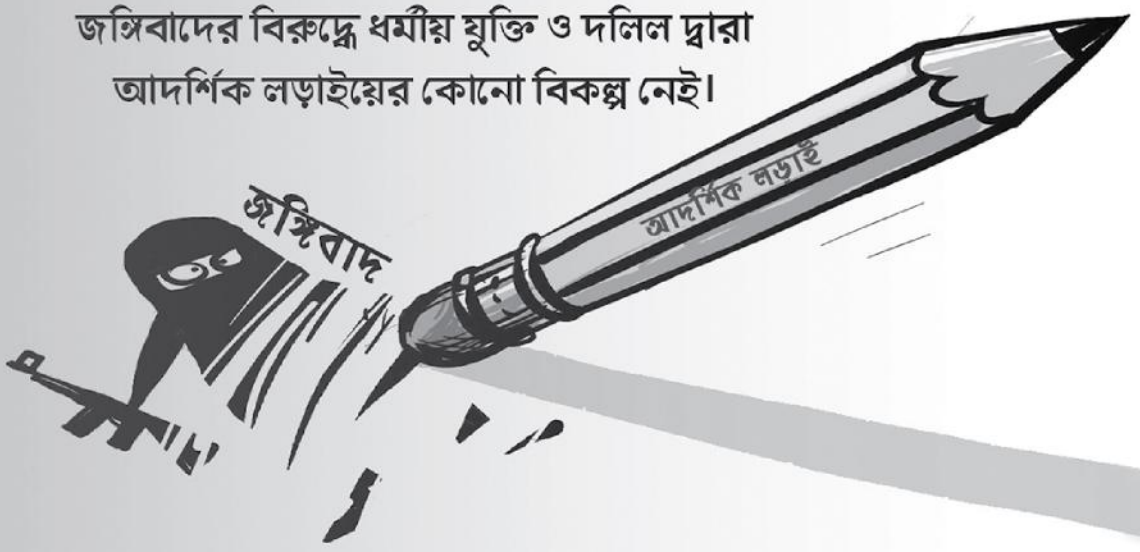

জঙ্গিবাদ নির্মূলের সঠিক আদর্শ

রাকীব আল হাসান

জঙ্গিবাদ/সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি:

সচেতন মানুষ মাত্রই এটা জানে যে, আশির দশকে সংঘটিত রুশ-আফগান যুদ্ধটিই হচ্ছে জঙ্গিবাদের সূতিকাগার। এ সময়টিতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই. আফগানদেরকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে লাখ লাখ যুবক আফগানিস্তানে ছুটে গিয়েছিল 'আলাহর রাস্তায়' যুদ্ধ করার জন্য। তারা কি বুঝেছিলেন যে, এটা জেহাদ ফি সাবিলিলাহ নয়, এটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আলাহ-রসুলের কিছু আসে যায় না? বুঝতে পারেন নি, কারণ এই যুবকদেরকে প্রাণদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পশ্চিমারা মুসলমান দেশগুলোতে হাজার হাজার ধর্মব্যবসায়ীকে ভাড়া করেছিল যারা তাদের নিজ নিজ দেশের যুবকদেরকে ওয়াজ-নসিহত করে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত (Motivated) করে সংঘটিত করেছিল। তারা বলত যে এটা সাধারণ যুদ্ধ নয়, জেহাদ ও কেতাল ফি-সাবিলিলাহ। এখানে মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি। শুধু তাই নয়, পরবর্তী প্রজন্মকে জঙ্গি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমারা ওই প্রকল্পের আওতায় আফগানিস্তানের বাচ্চাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্ত্রাস ও মারণাস্ত্র সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো হবে এমন তথ্য সেগুলোতে অনায়াসে দেওয়া হয়েছিল। তখন ইংরেজি বর্ণমালা পরিচয়ে 'জে'-তে জেহাদ শেখানো হতো। এমনকি গণনা শেখানোর সময় ৫ বন্দুক + ৫ বন্দুক = ১০ বন্দুক শেখানো হতো। এভাবে হাতে কলমে জঙ্গিবাদের শিক্ষা প্রচার করেছে যারা সেই পশ্চিমারাই আজ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন।

পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোই এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্যে জঙ্গিবাদ ইস্যুটির জন্ম দিয়েছে। তারপর তা বিশ্বময় রপ্তানি করে নিজেরাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ যুদ্ধের স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো পররাজ্য দখল করা, পরসম্পদ লুট করা, আর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'ইসলাম'-কে ধ্বংস করে দেওয়া। এর স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যটি নিয়ে আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই, এ বিষয়ে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিশেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমানের একটি উক্তিই যথেষ্ট হবে আশা করি। তিনি ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সূচনা

করে মুসলিম বিশ্বকে পদানত রাখার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে। দেশটি আফগানিস্তানে যুদ্ধের সূচনা করে, তা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।"

আর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো কম্যুনিজমের পতনের পর পশ্চিমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'ইসলাম'-কে ধ্বংস করে দেওয়া। এটা এখন পশ্চিমা আগ্রাসনকারীদের আত্মস্বীকৃত বিষয়। অনেকেই স্বীকার করেছেন, অনেকে এ নিয়ে দম্ভোক্তিও করেছেন। জঙ্গিবাদের উদ্গাতা কারা? কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করেছে এবং জঙ্গিবাদ থেকে লাভবান হচ্ছে মূলত কারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেক্রেটারি অব স্টেট হিলারি ক্লিনটন বলেন, "আজকে আমরা যে আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি কুড়ি বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে অর্থ যুগিয়েছি।' [১ জুন ২০১৪, ফক্স নিউজ, সি.এন.এন]। অন্যদিকে পাকিস্তানের সাবেক সেনাশাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফকে বলতে শোনা গেছে- তালেবান আমেরিকার সৃষ্টি (ডন, ০৫.১২.১৪)। আর বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া আইএস- এর জন্মের প্রেক্ষাপট যারা জানেন তাদেরকে বলে দিতে হবে না যে, কীভাবে পশ্চিমা জোট আসাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টায় আইএসকেই একদা সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে শক্তিশালী করেছে। এমনকি ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করার পরও কুর্দীদের অস্ত্র দেবার নাম করে আকাশ থেকে আইএসকে অস্ত্র প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্রই। অবশ্য জঙ্গিরাও অকৃতজ্ঞ নয়; তালেবান, আল কায়েদা বা আইএসের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীব্যাপী শোষণ অব্যাহত রাখতে যতখানি সুযোগ করে দিয়েছে তা অতীতে কেউ দিয়েছে বলে মনে হয় না।

এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ যে আসলে পশ্চিমাদের রাজনীতির খেলা, অর্থাৎ Political game, সেটাও প্রমাণিত। এতে তাদের লাভ হচ্ছে, তারা খনিজ ও তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে পারছে, পাশাপাশি অস্ত্রব্যবসা করে নিজেদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। আমাদের দেশের অর্থনীতিকে যেমন বলা হয় কৃষি অর্থনীতি, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ অর্থনীতি (War Economy)। যুদ্ধ না থাকলে তাদের অর্থনীতিতে মন্দা হবে। তাদের প্রয়োজন বিশ্বজোড়া অস্ত্রের বাজার। কিন্তু তারা নিজেরা আর স্বশরীরে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়। তাদের সৈন্যরা যুদ্ধবিমুখ ও ভোগবাদী। তাই দরকার হয়ে পড়েছে মুসলমানদের একটি দলকে আরেকটি দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া। সুতরাং জঙ্গিরা পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে 'অতি প্রয়োজনীয় শত্রু' (Useful enemy)। তারা যেমন জঙ্গিদেরকে জিইয়ে রাখতে চায় চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত, তেমনি অনেক দেশের সরকারও জঙ্গিবাদ নির্মূল হোক এটা চায় না। জঙ্গিরা থাকলে তাদের বহুমুখী স্বার্থোদ্ধারের পথ খোলা থাকে। (এ বিষয়ে হেযবুত তওহীদের এমামের লেখা বই- 'ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল: জঙ্গিবাদ' বইতে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে)

এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ যে আসলে পশ্চিমাদের রাজনীতির খেলা, অর্থাৎ Political game, সেটাও প্রমাণিত। এতে তাদের লাভ হচ্ছে, তারা খনিজ ও তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে পারছে, পাশাপাশি অস্ত্রব্যবসা করে নিজেদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

মানুষের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে:

জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে যে অস্ত্রটি নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো মানুষের ধর্মবিশ্বাস। টার্গেট করা হয়েছে কিছু মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে। ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজ (আমল) হলো জেহাদ (সত্য প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম)। এই জেহাদ করতে গিয়ে যদি কারোর জীবন যায় তবে তিনি শহীদ (সত্যের স্বাক্ষী) তথা চূড়ান্ত সফল বলে গণ্য হবেন, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন, তাকে মৃতও বলা যাবে না। অর্থাৎ এটি মো'মেন, মুসলিমদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানের পুরস্কার। এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে কোর'আন ও হাদিসেই রয়েছে। কিন্তু এসবের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে জঙ্গিসৃষ্টিকারী নেতারা কোর'আন ও হাদিসের এই বক্তব্যগুলো দেখিয়ে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ (Motivated) করছে। তাদের মধ্যে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস থাকার কারণে তারা জঙ্গিবাদী নেতাদের এই বক্তব্যগুলো খুব সহজেই মেনে নিচ্ছে আর জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে, এখানে সেখানে বোমা মারছে, মানুষ হত্যা করছে, আত্মঘাতী হচ্ছে। এভাবে মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে ভুল খাতে প্রবাহিত করার মাধ্যমে জঙ্গি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই জঙ্গিবাদীদের সবচেয়ে বড় শক্তিই হলো তাদের

আফগানিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ফতোয়াবাজ মোলাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ তরুণকে ধারণা দেয় যে, আফগান যুদ্ধ হচ্ছে আলাহর রাস্তায় জেহাদ।

ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাস।

সাধারণ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে দেখা যায় হত্যাকারীরা নিজেদেরকে গোপন করতে চায় এবং তাদের দল বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীও এর দায় নিতে চায় না, কিন্তু জঙ্গি হামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় হত্যাকাণ্ডের পরপরই তারা দায় স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডে তারা অনুতপ্তের পরিবর্তে উলসিত হয়। চলতি বছরে যতগুলো জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে হয়েছে তার সবকটিতেই দেশি-বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠী দায় স্বীকার করেছে।

এমনকি একটি ঘটনায় খুন করে হাতেনাতে ধরা পড়ার পরেও তাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা লক্ষ করা যায়নি। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত তাদের বিশ্বাস তারা উত্তম কাজই করছে, তারা তাদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করছে। সুতরাং তাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও তারা নিজেদের সফল ভাববে। নিজ মতাদর্শীদের কাছে তারা শহীদ বলে বিবেচিত হবে। তাদের শাহাদাত দেখিয়ে খুনের নেপথ্যে থাকা কথিত হুজুররা(!) এমন হাজারো সরলপ্রাণ তরুণকে একই রকম হত্যাকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবেই সরল বিশ্বাসী তরুণদেরকে বিকৃত ইসলামী মতাদর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে জঙ্গিতে পরিণত করা হচ্ছে। এক শ্রেণির স্বার্থবাজ ধর্মব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সেই ভ্রান্ত আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে অর্থাৎ ঈমানকে ভুল পথে প্রবাহিত করছে। তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এটা জেহাদ, এটা করলে তুমি জান্নাতে যাবে, এই কাজে নিহত হলে তুমি শহীদ হবে। এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, প্রভাবিত (Influenced, Motivated) হয়ে মানুষ জঙ্গি হচ্ছে, সহিংসতার পথ বেছে নিচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, মানুষের মূল্যবান ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস ভুল খাতে প্রবাহিত হয়ে তাদের দুনিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আখেরাতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যে ঈমান মানবতার কল্যাণে কাজে লাগে না সে ঈমান আখেরাতে জান্নাতে নিতে পারবে না। হাশরের দিন এই সব ধর্মীয় নেতারা কঠিন জবাবদিহির সম্মুখিন হবেন।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে:

জঙ্গিবাদকে নির্মূল করার জন্য আমাদের দেশসহ আন্তর্জাতিকভাবে কেবল শক্তি প্রয়োগের পন্থাই বেছে নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ বিশ্বের পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন অর্থ ব্যয় করছে এই জঙ্গিবাদ বিরোধী যুদ্ধে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তারা অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে, তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে অবিরাম জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে, তাদের প্রশিক্ষিত মেধাবী সামরিক অফিসার, গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এভাবে গত ২০০১ সাল থেকে তারা বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কি বিপুল পরিমাণ শক্তি ক্ষয় করেছে তার হিসাব মেলানোই কঠিন। যদিও বিভিন্ন মহল থেকে এখন স্বীকার করা হচ্ছে যে শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়, এর জন্য আদর্শ প্রয়োজন তবুও সঠিক আদর্শ কারোর কাছে না থাকায় পৃথিবীব্যাপী জঙ্গিবাদ নির্মূলে এখন পর্যন্ত এই শক্তি প্রয়োগের নীতিই প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প পন্থা খোঁজার ঘোষণা দিয়েছেন ২০০৯ সালে (BBC, The STAR, 3 April, 2009), কিন্তু বিকল্প কোনো পন্থা না পাওয়ায় তারা আজও প্রচলিত শক্তি প্রয়োগের পন্থার উপরই নির্ভর করছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে, জঙ্গিরা নতুন নতুন কৌশল ধারণ করছে। কিন্তু

আমাদের দেশও শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের পন্থাই গ্রহণ করেছে। মনে করা হচ্ছে- শুধুমাত্র জঙ্গিবাদের জড়িতদের গ্রেপ্তার, বিচার ও কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রয়োগ করলেই জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যাবে।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়:

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধ যতই বিস্তার লাভ করেছে, জঙ্গিবাদও ততই তার ডাল-পালা বিস্তৃত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি তালেবান-আল কায়েদার মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে আফগানিস্তান থেকে ফিরে গেছে এবং নিজেদের অসফলতার কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ব ক্রমেই আরও বেশি সংঘাতপূর্ণ হচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার পর পশ্চিমা বিশ্ব যে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার পর থেকে সন্ত্রাসী ঘটনা কমা তো দূরের কথা অরো অনেক বেড়েছে। 'বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচক' অনুযায়ী গত দেড় দশকে এসব হামলায় নিহতের সংখ্যা আগের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। বারাক ওবামা নিজে বলেছেন, "বুলেট-বোমা দিয়ে জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করা যাবে না, বিকল্প পন্থা খুঁজতে হবে।" তালেবান ও আল কায়েদার বিরুদ্ধে প্রায় এক যুগ লড়াই করার পর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এসব অসহায় স্বীকারোক্তি কী বার্তা বহন করে? এর মাঝে তারা কী পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করেছে, কী অঢেল অর্থব্যয় করেছে তা বিজ্ঞ মানুষমাত্রই জানেন। বছর কয়েক আগের ইউরোপ-আমেরিকায় সংঘটিত বিরাট অর্থনীতিক মন্দার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে সংশিষ্ট দেশগুলোর অকল্পনীয় অর্থব্যয়। অথচ এত এত অর্থব্যয়ের পর, সামরিক শক্তিতে অপ্রতিরোধ্য বলে কথিত পরাশক্তিগুলো ব্যর্থতার গানি বরণ করছে। সামরিক শক্তি, অর্থবল ও মিডিয়ায় সমৃদ্ধ বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোই যদি শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের সরকার কতটুকু সফল হবে তা বিবেচ্য বিষয়।

সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের পন্থাতেই কি সরকার সীমাবদ্ধ থাকবে? নাকি শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি নতুন কোনো সমাধানের খোঁজ করবে? শুধু শক্তি ও অর্থব্যয়ের ব্যর্থতার আরেক প্রমাণ হলো- খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান সরকার ও আফগান সরকার এখন তালেবানদের সাথে আলোচনা-পরামর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করছে, যা কয়েক বছর পূর্বেও অকল্পনীয় ছিল। সুতরাং বোঝা গেল, শক্তি প্রয়োগের প্রচলিত পন্থায় সম্পূর্ণভাবে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়। অথচ জঙ্গিবাদ দমনে বরাবরই কেবল শক্তি প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য লাগবে সঠিক আদর্শ:

জঙ্গিবাদ নির্মূলে শক্তি প্রয়োগেরও দরকার আছে, একেবারে শক্তি ছাড়াও হবে না। কিন্তু ওটা মূল পন্থা নয়। যেহেতু জঙ্গিবাদ একটি বিকৃত ধর্মীয় আদর্শ তাই একে নির্মূল করতে হলে অবশ্যই সঠিক একটি আদর্শ লাগবে। আদর্শটি হতে হবে কোর'আন, হাদিস ও যুক্তিনির্ভর। সন্ত্রাসীদেরকে যদি কোর'আন হাদিস ও ইতিহাস থেকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাদের ভুল কোথায় এবং কেন তারা জীবন উৎসর্গ করলেও আলাহ-রসুলের সন্তুষ্টি লাভ করবে না, জান্নাত লাভ করবে না এবং সঠিক পথ কোনটা সেটাও প্রদর্শন করতে হবে, কেবল তাহলেই তারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ত্যাগ করতে পারে। সেই সাথে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যেও ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ব্যাপক গণজাগরণ তৈরি করতে হবে। সাধারণ মানুষের ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস যতদিন না কল্যাণের পথে ব্যবহার করা যাচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ী ও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী ততদিন তাকে অকল্যাণের পথে ব্যবহার করতেই থাকবে। মানুষের ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসকে বিনষ্ট করে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তা কাম্যও নয়। আর ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস আছে মানেই তা ব্যবহৃত হবেই। তাই চেষ্টা চালাতে হবে অকল্যাণের পথে ব্যবহৃত না হয়ে মানুষের ঈমানী শক্তিকে জাতির কল্যাণের পথে ব্যয় করার। জঙ্গিরা যে ভুল পথে আছে তা তাদেরকে বোঝানোর জন্য ও সাধারণ মানুষকে ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করার জন্য কোর'আন ও হাদিসভিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি আমাদের অর্থাৎ হেযবুত তওহীদের হাতে আছে। এটা যে নিছক আশ্বাসবাণী নয়, প্রকৃতপক্ষেই

সাধারণ মানুষের ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস যতদিন না কল্যাণের পথে ব্যবহার করা যাচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ী ও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী ততদিন তাকে অকল্যাণের পথে ব্যবহার করতেই থাকবে।

জঙ্গিদেরকে ভুল প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট যুক্তি, প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্য আমাদের কাছে আছে, সেটা অতি স্বল্প পরিসরে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

বিকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম: ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়া

জঙ্গিরা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে, জেলে যাচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলছে, শত্রুর গোলা-বারুদে ঝাঁঝরা হচ্ছে সেই ইসলাম আর আলাহর রসুলের ইসলাম এক নয়। বর্তমানে ইসলামের নাম করে যে দীনটি প্রচলিত আছে তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রকৃত ইসলামের মতো মনে হলেও, আত্মায় ও চরিত্রে আলাহর রসুলের ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটাকে আইএস, বোকো হারাম, আল কায়েদা, ইখওয়ান, তালেবানরা ইসলাম মনে করছে এবং ভাবছে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করে স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা যাবে কিন্তু সেটা বিগত ১৩০০ বছরের ধারাবাহিক বিকৃতির ফল, প্রকৃত ইসলামের ছিটে ফোটাও এর মধ্যে নেই। দীন নিয়ে অতি বিশেষণকারী আলেম, মুফতি, মোফাস্‌সের, মোহাদ্দেস, সুফি, দরবেশ ও পীর-মাশায়েখদের অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক, বাহাস, মতভেদ ও চুলচেরা বিশেষণের পরিণামে দীনের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে অনেক আগেই, সেই ভারসাম্যহীন দীনের ভিন্ন ভিন্ন ভাগকে আঁকড়ে ধরে ছিল ভিন্ন ভিন্ন ফেরকা-মাজহাব, দল-উপদল। এর মধ্যে ইসলাম পারস্যে প্রবেশ করলে সেখানকার পূর্ব থেকে বিরাজিত বিকৃত আধ্যাত্মবাদ ইসলামে প্রবেশ করল। বিকৃত সুফীবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে এক সময়ের প্রগতিশীল, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, বহির্মুখী, উদার, যুক্তিপূর্ণ ইসলাম অন্তর্মুখী, গতিহীন, অযৌক্তিক, পলায়নপর সাধু-সন্ন্যাসের ধর্মে পরিণত হলো। তারপর আসলো ব্রিটিশরা। তারা এই জাতির কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকল। আগের শিক্ষাব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে নিজেরা মাদ্রাসা তৈরি করে সেই মাদ্রাসায় ব্রিটিশরা তাদের তৈরি সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী তাদের সুবিধামতো একটি বিকৃত ইসলাম এই জাতিকে শিক্ষা দিল। ফলাফল- মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বরকম প্রচেষ্টা ত্যাগ করে রসুলালাহর রেখে যাওয়া ঐক্যবদ্ধ জাতি এখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, 'তেহাত্তর' ফেরকায় বিভক্ত। তারা একে অপরের রক্তে হোলি খেলছে। ব্রিটিশদের শেখানো এই বিকৃত ইসলাম পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও শান্তি আনয়ন করতে ব্যর্থ, এমনকি এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ীরা সেই বিকৃত ইসলাম বিক্রি করে স্বার্থ হাসিল করছে অর্থাৎ বিনিময় নিচ্ছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বস্ব কোরবানি দেওয়ার প্রেরণা শিক্ষা দেওয়া হয়নি; ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়নি। সুতরাং একে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা জীবন দেবে, সম্পদ দেবে তারা যে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই।

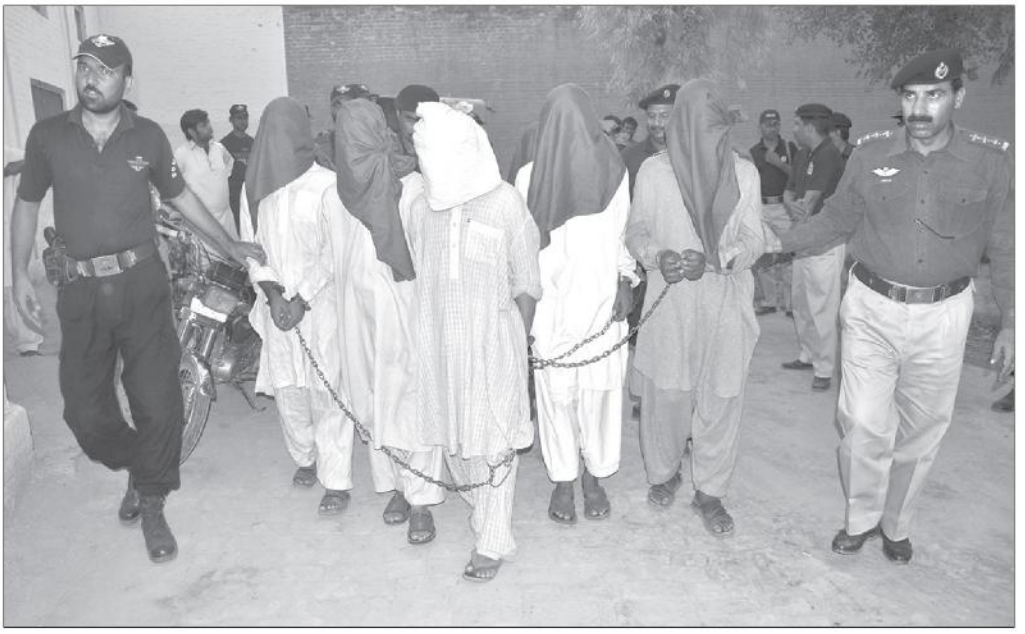

আলাহর সাহায্য ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নয়। ইসলামের নামে বিভিন্ন দেশে জংগিবাদের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে তা আলাহর দেয়া প্রকৃত ইসলাম নয়। ফলে তারা আলাহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পায় নি।

তারা আলাহর কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না কেন?

আলাহর দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আলাহর সাহায্য (help, নসর) অবশ্যই লাগবে। আলাহর সাহায্য ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তারা যেটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে সেটা আলাহর ইসলাম নয়। সেটা প্রকৃত ইসলাম হলে তারা অবশ্যই আলাহর সাহায্য পেত। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, মিশরসহ কোথাও তো দেখছি না তাদের সাথে আলাহর সাহায্য আছে। আলাহ যাদের সাহায্য করবেন তাদের পরাজয় অসম্ভব এটা পবিত্র কোর'আনে আলাহ বার বার বলেছেন। কাজেই এতেই প্রমাণিত হয় তারা যেটা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন সেটা আলাহর ইসলাম নয়। বিগত শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে কিন্তু তারা তেমন উলেখযোগ্য সফলতা পায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো নানাভাবে তাদের শাসন ও শোষণকে প্রসারিত করেছে। তাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে এই চরমপন্থীরা এখন মরিয়া। তারা এখানে ওখানে বোমা ফাটাচ্ছে, হামলা চালাচ্ছে। আলাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পেলে তাদের এই অবস্থায় উপনীত হতে হতো না।

ইসলামের প্রকৃত আকীদা হারিয়ে গেছে

প্রকৃত আকীদার অনুপস্থিতির কারণে জঙ্গিবাদের পথ আরও প্রশস্ত হচ্ছে। ইসলামে আকীদার গুরুত্ব অতুলনীয়। এই দীনের আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে তারা সকলেই একমত যে, আকীদা সঠিক না হলে ঈমানের মূল্য থাকে না। জঙ্গিদের ঈমান আছে, শুধু আছে বললে ভুল বলা হয়, তাদের ঈমান অন্য আর দশজন সাধারণ মুসলিমের চেয়ে অনেক বেশি। দৃঢ় ঈমান না থাকলে কেউ জান দিতে যায় না। কিন্তু এত প্রবল ঈমানের কী দাম থাকে যদি আকীদা সঠিক না হয়? আকীদা হচ্ছে comprehensive concept, সম্যক, সামগ্রিক ধারণা, অর্থাৎ একটি কাজ কেন করা হবে, কীভাবে করা হবে, কখন করা হবে, কোন কাজ আগে কোনটা পরে, কোনটা এখন কোনটা তখন, কোনটা খুব প্রয়োজনীয়, কোনটা কম প্রয়োজনীয়, কোনটা না হলেই নয় কোনটা না হলেও চলবে, কোনটার পূর্বশর্ত (precondition) কোনটা, কোন কাজ দ্বারা মানবতার কী উপকার হবে বা কী ক্ষতি হবে ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা। অথচ যে জেহাদের কথা বলে জঙ্গিবাদ ছড়ানো হচ্ছে সেই জেহাদ সম্পর্কেও জঙ্গিদের আকীদা সঠিক নয়। উপরন্তু আকীদাকে অনেকে ঈমানের সাথেই গুলিয়ে ফেলছেন, অথচ আকীদা ও ঈমান যে পৃথক বিষয় তা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। ইসলামের জেহাদ কী জন্য, রসুল কখন কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে জেহাদ করেছেন, কখন কিতাল করেছেন সে সম্পর্কে সঠিক আকীদা না থাকায় জঙ্গিরা সন্ত্রাসকেই জেহাদ বলে মনে করছে। কাজেই ইসলামের প্রকৃত আকীদা জানতে পারলে অনেক বিপথগামী জঙ্গিই সন্ত্রাস ত্যাগ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

জাতিকে আগে তওহীদের জ্ঞান প্রদান করতে হবে:

জঙ্গি মনোভাবসম্পন্ন মানুষদেরকে তওহীদের প্রকৃত অর্থ বোঝাতে হবে। দীনের ভিত্তি বা প্রাণ হলো তওহীদ। জীবনের সকল অঙ্গনে যেখানে আলাহ ও আলাহর রসুলের কোনো কথা আছে, সেখানে অন্য কারোটা না মানাই তওহীদের একমাত্র দাবি। সেই তওহীদ কি আজকের মুসলিম নামধারী জাতির মধ্যে আছে? নেই। আজ এই জাতি জাতীয় জীবন থেকে আলাহর হুকুম, বিধি-বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সিস্টেম গ্রহণ করেছে। ইসলাম বলতেই এরা বোঝে নামাজ, রোজা, এবাদত-উপাসনা এবং জিকির-আজগার, তসবীহ-তাহলীল, ওযু, গোসল, মেসওয়াক বা লেবাসের মতো ব্যক্তিগত জিনিস। অথচ আলাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, দীনের ব্যক্তিগত ভাগ মেনে ও জাতীয় ও সামষ্টিক ভাগ প্রত্যাখ্যান করে এরা যে তওহীদ থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে, আলাহর চোখে এরা আর যে মো'মেন নেই, মুসলিম নেই, বরং মোশরেকে পরিণত হয়েছে সে জ্ঞান তাদের নেই। কাজেই যারা পুনরায় ইসলামের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে চায় তাদেরকে একদিকে যেমন নিজেদের অবস্থান বুঝতে হবে, সেই সাথে বুঝতে হবে জাতি বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে। যে জাতিতে তওহীদই নেই, যারা জাতীয় জীবনে আলাহর হুকুম, ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তওহীদের আহ্বান না জানিয়ে, তওহীদের মর্মার্থ না বুঝিয়ে অর্থাৎ মানসিকভাবে জাতিকে আলাহর বিধান গ্রহণ করার উপযোগী না করে আগেই জেহাদের জিগির তোলা সুবিবেচনার কাজ হতে পারে না। জাতিকে আগে সত্য-মিথ্যা,

ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝাতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ থেকে অশান্তি দূর করার জন্য সংগ্রাম করাই যে একজন মু'মিনের প্রধান কর্তব্য, এবাদত সেটা সকলকে বোঝাতে হবে। তাদেরকে আরও বোঝাতে হবে যে, ধর্মের কোনো বিনিময় চলে না, ব্যবসা চলে না। ধর্মের কাজ হবে একমাত্র আলাহর উদ্দেশে। এভাবে জাতিকে আগে ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য, তওহীদ, শিরক, কুফর ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে। যুগ যুগ ধরে এদের বিশ্বাসে, আচারে, প্রথায় যে অজ্ঞতা বাসা বেঁধেছে তা দূরীভূত করতে হবে। তা না করে যাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম, সেই সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করে। এভাবে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ শান্তি আনয়ন সম্ভব নয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গত দুই-এক দশকের ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইতিহাসের শিক্ষা

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইরত তথাকথিত জেহাদী গোষ্ঠীগুলো তাদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য রসুলালাহর জীবনী থেকে বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করে থাকেন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের সমর্থনে কোর'আন হাদীসের রেফারেন্সও দিতে পারে। কারণ রসুলালাহ তাঁর নবী জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য। কিন্তু আরেকটু গভীরে গেলেই প্রকৃত ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জঙ্গিরা প্রধানত যে ভুলটি করে তাহলো- আলাহর রসুলের জীবনের দুইটি ভাগ, অর্থাৎ মক্কা জীবন ও মদীনা জীবনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া; অথচ মক্কা ও মদীনায় রসুলালাহর কর্মপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মক্কায় তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে তওহীদের বালাগ দিয়ে গেছেন। শত অন্যায়, অবিচার সহ্য করেছেন। মুশরিকদের নির্দয় আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। সঙ্গী-সাথীরা ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অবরুদ্ধ ও একঘরে জীবনযাপন করেছে। কয়েকজনকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। রসুলের সামনে দিয়ে সাহাবিদের টেনে-হিঁচরে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, রসুলালাহ বাধা পর্যন্ত দিতে পারেন নি। এত নির্যাতনের মাঝেও মক্কা জীবনে যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। সেখানে একটাই কাজ- সমস্ত নির্যাতন, নিপীড়ন, ঠাট্টা, বিদ্রূপ উপেক্ষা করে যথাসম্ভব তওহীদের বালাগ চালিয়ে যাওয়া, ঘুমন্ত মানুষগুলোর অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে তোলা, তাদেরকে যাবতীয় অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা। অতঃপর যখন মদীনায় একটি জনগোষ্ঠী রসুলালাহর আহ্বান গ্রহণ করল, রসুল হেযরত করলেন এবং মদীনার মুসলিম-অমুসলিম সকলকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা (General will) এবং সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে (On the basis of common interest) চুক্তির মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন, রসুল (স.) তখন নবগঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। আর স্বাভাবিকভাবেই নবগঠিত ওই রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী ও অস্ত্র-শস্ত্র দরকার পড়েছিল। সেখান থেকেই সামষ্টিক কারণে রসুলালাহ ও তাঁর সাহাবাদের যোদ্ধা জীবন শুরু, কোনো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়। সেই যুদ্ধ প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি ও ধর্মীয় বিধান কোনো দৃষ্টিতেই অবৈধ ছিল না।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তি বা দলগতভাবে কেউ অস্ত্র হাতে নিলে সেটা ইসলাম হবে না, কারণ রসুল তা নেন নি। অস্ত্রের ব্যবহার, সেনাবাহিনীর ব্যবহার করতে পারে একমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ রসুলালাহর কর্মপদ্ধতিকে ভুল মনে করা।

জঙ্গিদের উদ্দেশে দু'টি কথা:

যারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বা আদর্শগত কারণে জঙ্গিবাদ সমর্থন করেন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার-প্রচারণায় তারা আহত ও ক্ষুব্ধ হতে পারেন। ভাবতে পারেন যে- 'আমরা ইসলামের জন্য জীবন বাজি রেখে তাবৎ দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছি, আলাহর দীনকে সম্মুন্নত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি অথচ হেযবুত তওহীদ আমাদের কোরবানিকে অবজ্ঞা করছে, আমাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে।' প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হলো, যাদের উদ্দেশ্য সৎ, যারা ইসলামের জন্য অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করে এবং আলাহ-আলাহর রসুলের জন্য যাদের হৃদয়ে অপরিমেয় ভালোবাসা রয়েছে তাদেরকে আমরা কিছুতেই অবজ্ঞা করতে পারি না; কিন্তু যখন দেখি এই জাতির মূল্যবান প্রাণগুলো বিপথে পরিচালিত হয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির নোংরা খেলায় এই জাতির দৃঢ় ঈমানের মানুষগুলো ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের জীবন-সম্পদ আলাহ-রসুলের উপকারে না লেগে ইসলাম ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাদের অভিসন্ধি পূরণের রসদ যোগাচ্ছে তখন আমরা কষ্ট পাই, ব্যথিত হই। দুঃখে বুক ভেঙ্গে যায়। আমাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদেরকেই হত্যা করাচ্ছে। আমাদের স্থাপনা, পর্যটনকেন্দ্র, মসজিদ,

রাস্তাঘাটগুলো ধ্বংস করাচ্ছে। বোমার আঘাতে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে আমাদেরই শহর-নগর-বন্দর, ছিন্নভিন্ন হচ্ছে আমাদেরই শরীর। আফগানিস্তানের মাটিতে সোভিয়েত-রাশিয়ার স্বার্থের দ্বন্দ্বে এই জাতির অকুতোভয় সন্তানদের জেহাদের নামে বলি হতে দেখে আমরা ব্যথিত হই। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণের পথ প্রশস্ত করার জন্য মুসলমানদের বুকে টেনে নেয়, আবার স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন জঙ্গি, চরমপন্থী, মৌলবাদী অপবাদ দেয় তখন আমাদেরও অন্তর্জ্বালা কম হয় না। বাস্তবতা হচ্ছে, যারা বর্তমানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের বহু ত্যাগ-স্বপ্ন-সাধনা ও প্রাণক্ষয় কার্যত জাতিকে এতটুকু লাভবান করে নি। বরং ইসলামের ক্ষতিই হয়েছে। উপকার হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের, উপকার হয়েছে ইসলামের শত্রুদের।

সুতরাং আপনারা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লড়াই করছেন, সেই ইসলামের স্বার্থেই ওপথ থেকে ফিরে আসুন। এতে আপনারা নিজেরা যেমন উপকৃত হবেন, জাতিও উপকৃত হবে। আমাদের এই দেশের মাটিতে থেকে, দেশের মানুষের কল্যাণে অবদান রাখা যায়। মু'মিন হবার জন্য জান-মাল নিয়ে ইরাক-সিরিয়া যাবার দরকার নেই; সিরিয়া এখন পরাশক্তির যুদ্ধ ক্ষেত্র (War field)। তাদের রণ দামামায় ৩য় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। তারা ইতঃপূর্বে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে ১৪ কোটি আদম সন্তান হত্যা করেছে। সেই জান-মাল আপনারা এই দেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত, অন্যায়-অবিচারে ক্লিষ্ট, দরিদ্র-বুভুক্ষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগান; হানাহানি, রক্তারক্তিতে লিপ্ত ও দল-মত, ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত জাতির মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করুন। এতে আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানকে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই:

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞা করার বা খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই যদিও তা করা হচ্ছে। যদি একে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে তাদের ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানকে ধর্মব্যবসায়ী একটি শ্রেণি ভুল খাতে প্রবাহিত করে জাতির অকল্যাণ করবে। ধর্মবিশ্বাস অস্বীকার করার সুযোগ নেই। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় ধর্মহীন বস্তুবাদী সভ্যতা শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, প্রচার মাধ্যমে বহু অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সেটা করতে সক্ষম হয় নি। কারণ:

১. মানুষের ভেতরে স্রষ্টার রূহ অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ রয়েছে। সে অবচেতন মনেই আপন স্রষ্টাকে অনুভব করে, যে কোনো কষ্টে, সংকটে তাঁর কাছে আশ্রয় চায়।
২. আলাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় বাণী মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মাথায় করে রাখছে, সন্তানকে যেমন যত্ন করা হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতা-বিবর্জিত, নিতান্তই অর্বাচীন ও মূঢ়তাসুলভ পরিকল্পনা।
৩. অতীতে হাজার হাজার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। এই ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। এ মতবাদগুলো তাত্ত্বিকভাবে সুন্দর কিন্তু কখনো বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায় নি। পক্ষান্তরে ধর্মের শাসনে প্রাপ্ত সেই অনুপম শান্তির স্মৃতি মানবজাতির মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের দিকেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি যামানা, The Last hour) আবার ধর্মের শাসন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ-বৈরিতা থাকবে না, কোনো অবিচার, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিময় (Kingdom of Heaven) হবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ সত্য ধর্মের উত্থানই কামনা করে। এটা তাদের ঈমানের অঙ্গীভূত, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

কাজেই এখন একটাই করণীয় এই জনগোষ্ঠীকে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে, অনুপ্রাণিত করতে হবে। একটা সঠিক ও নির্ভুল আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবেই এই ধর্মবিশ্বাস অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেবে। যদি অবজ্ঞা করা হয় তবে তা বার বার ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা ভুল পথে

সকলেই চান জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধতা এবং জনসচেতনতা কিন্তু কী কথা দিয়ে?

রিয়াদুল হাসান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাঃ

● বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে, এমন বিষয় স্বীকার করে নিতে আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ আছে। কিন্তু বিষয়টি স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশের অবস্থা সিরিয়া কিংবা পাকিস্তানের মতো হবে এবং বাংলাদেশে ওপর হামলে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। এটা যাতে না হয়, সেজন্যে জাতি হিসেবে সবাইকে সচেতন হতে হবে। (বিবিসি বাংলা ০৮/১১/২০১৫)

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেওয়া, আইনের হাতে সোপর্দ করা এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা লাগবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও শক্তিশালী করা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশের মানুষকে সচেতন করা। সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হলেই দেশকে আরও শান্তিপূর্ণ করা সম্ভব। (দৈনিক প্রথম আলো ১৭/১১/২০১৫)

● সাংবাদিকদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লেখনির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। (দৈনিক সমকাল, ০১/০৭/১৫)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালঃ

● শক্তি প্রয়োগ না করে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হবে। সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। এ জন্য গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানো হবে। (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ১০/০৪/২০১৪)

● জঙ্গিদের পুরোপুরি প্রতিহত করতে সরকারের সঙ্গে জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। (লেটেস্ট বিডি নিউজ ১০/১১/২০১৫)

● যে কোনো মূল্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা হবে। (দৈনিক ইত্তেফাক ১৩/১১/২০১৫)

আই.জি.পি এ কে এম শহীদুল হকঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে চার-পাঁচটি ছেলে দুই-তিনটা মেয়েকে শীলতাহানি করল। যাদের সামনে এই ঘটনা ঘটাল, সেই পাবলিকরা তাদের কেন ধরল না। পাবলিকই তো তাদের শায়েস্তা করতে পারত। প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত অধিকার আছে, তাদের সামনে অপরাধ ঘটলে তারাই তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। এতে পুলিশের গ্রেপ্তার করা লাগত না। (দৈনিক প্রথম আলো- ১৪/০৫/২০১৫)

র‍্যাব মহাপরিচালক বেনজির আহমেদঃ

দেশে নতুন করে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। দেশে আইএস এর কোন অস্তিত্ব নেই। সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একটি গোষ্ঠী আইএস এর অস্তিত্ব আছে বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। (দৈনিক কালের কণ্ঠ ৯/১১/২০১৫)

● দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল করবে র‍্যাব। (দৈনিক যুগান্তর ১৮/০২/২০১৫)

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলামঃ

দেশের চলমান সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ দমনে দেশের জনগণের সহযোগিতারও দরকার রয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান যাতে রোধ করা যায় তার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদ পুরোপুরি নির্মূল করা জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। জঙ্গিবাদ রোধে আরেকটি বড় সমস্যা হলো, যারা এসবের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে তারা এর থেকে আর ফিরে আসতে পারে না। কারণ তারা মনে করে, এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। আর এ কারণেই তাদের অনেকে কারাগার থেকে জামিনে বেরিয়ে পুরনো কাজে ফিরে যায়। তবে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কঠোর আইনেরও প্রয়োজন আছে। (এটিএন- টক শো - নিউজ আওয়ার এক্সট্রা, দৈনিক কালেরকণ্ঠ ৩ মার্চ ২০১৫)

● Terrorism এর পিছনে একটি Ideology থাকে। Ideology-কে Ideology দিয়ে ফাইট করতে হবে। এটাকে বলা হয় War of Ideas। তারা যে Ideology প্রচার করছে যেমন কোর'আনের আয়াত কিম্বা কোন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে মানুষকে আকৃষ্ট করছে। এটার সঠিক ব্যাখ্যা জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। মোদ্দাকথা Awareness একটি বড় ব্যাপার। Awareness এর কাজটা পুলিশ বা Law Enforcing Agency করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু অন্যদেরও এগিয়ে আসা দরকার। (টকশো- মাছরাঙা টেলিভিশন, ২৮/০৮/২০১৩)

বিশেষক ও বিশিষ্ট নাগরিক:

● এখন যে সংকট বাংলাদেশের জনগণ মোকাবিলা করছে, তাকে শুধু রাজনৈতিক বললে হবে না। এটাকে আদর্শিকভাবেও মোকাবিলা করতে হবে। (জুলফিকার আলী মানিক, সাংবাদিক, ঢাকা ট্রিবিউন, এটিএন- টক শো - নিউজ আওয়ার এক্সট্রা, দৈনিক কালেরকণ্ঠ ৩ মার্চ ২০১৫)

● এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ হবে, উভয় দেশের (পাকিস্তান ও মিয়ানমার) জনগণকে এই জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। জঙ্গিরা যাতে ইসলামের নামে সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকে বিপথে পরিচালিত করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে উভয় দেশের সরকারকেই। একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে সচেতন জনগোষ্ঠীকেও। (দৈনিক কালেরকণ্ঠ সম্পাদকীয় ২২ নভেম্বর ২০১৪)

● দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ এতোই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে তা বর্তমানে জঙ্গিবাদে রূপ নিয়েছে। এই জঙ্গিবাদ রুখতে বিকল্প হিসেবে জনগণের শক্তি গড়ে তোলার সময় হয়েছে। (রাশেদ খান মেনন, ৮/০৮/২০১৫)

● বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে মতাদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূল অথবা স্থায়িভাবে দমন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সমাজকে এ ধরনের হুমকি থেকে নিরাপদে রাখতে হলে বহুমুখী তৎপরতার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন রয়েছে একটি জাতীয় ঐকমত্য গঠনের এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই কালো থাবাকে প্রতিহত করা। (ব্রিগেডিয়ার অব. সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম আলো, ১২/১১/১৪)

● জঙ্গি সংগঠনগুলোর কু-আদর্শকে পরাজিত করতে হলে সু-আদর্শের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দরকার। (মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.), দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২২/০৭/১৫)

● বাংলাদেশের ৮৯-৯০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অনেকেই রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতিতে অহেতুক ধর্মকে টেনে আনেন, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করতেও দ্বিধা করেন না। এসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে যে ধর্মপ্রাণ মানুষ আহত হতে পারেন, তাও মনে রাখেন না। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নন। তবে ধর্মপ্রাণ মানুষ আহত হন এমন কিছু করলে জঙ্গিবাদীরা সেই সুযোগ নিতে পারে (এম সাখাওয়াত হোসেন, দৈনিক যুগান্তর ৪/০৩/২০১৪)।

● বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল হয়েছে, এমন কথা আমরা কখনো বলি নি। যদি কেউ বলে থাকেন, তাঁরা সত্য বলেন নি। কাউন্টার টেররিজম ও অ্যান্টি টেররিজম দুটি আলাদা বিষয়। অ্যান্টি টেরোরিজম বা সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে জঙ্গিদের নির্মূল করা যায়, তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়া যায়, কিন্তু তাদের যে আদর্শ বা দর্শন জঙ্গিবাদ তা নির্মূল করতে হবে উন্নত রাজনৈতিক আদর্শ দিয়ে (শাহেদুল আলম খান, নিরাপত্তা বিশেষক, দৈনিক প্রথম আলো ২৬/০২/২০১৪)।

প্রিয় পাঠক, উপরিউক্ত মন্তব্যগুলোর মধ্যে খেয়াল করুন কয়েকটি বিষয় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে:

১. শুধু শক্তি দিয়ে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যাবে না
২. কারণ জঙ্গিবাদের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িত
৩. তাই একে মোকাবেলা করতে একটি সঠিক ধর্মীয় আদর্শ লাগবে
৪. তা দিয়ে জনগণকে সচেতন/উদ্বুদ্ধ/সম্পৃক্ত করতে হবে
৫. বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র বানাতে ভেতরে বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে
৬. এর বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গঠন করতে হবে
৭. এই কাজে দেশের সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে

বলা হচ্ছে যে জনগণকে নিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং এজন্য জনগণকে একটি ধর্মীয় আদর্শ দ্বারাই প্রণোদিত (Motivate) করতে হবে। এই আদর্শটি কোথায় পাওয়া যাবে? এটা কি মাদ্রাসায় শেখানো হয়? এটা কি আলেমদের কাছে আছে? না।

মাদ্রাসায় শেখানো হয় সুরা কেরাত, কোরান-হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশেষণ, আরবি ব্যাকরণ, মাসলা-মাসায়েল ইত্যাদি। মাদ্রাসায় জীবনমুখী কোনো শিক্ষা না থাকায় বাধ্য হয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকেই জীবিকার মাধ্যম হিসাবে তারা গ্রহণ করেন। তাদেরকে ঐ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে প্রায় অন্ধ বানিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকায় জঙ্গিবাদের প্রতি তারা অনেকেই মৌন সমর্থন পোষণ করেন, হয়তো সুযোগের অভাবে যোগদান করতে পারেন না। এক কথায় মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনো শিক্ষা সেখানে নেই, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় তো নেই-ই। সেখানে শুধু একচেটিয়াভাবে জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করা হচ্ছে, কিন্তু পাল্টা কোনো আদর্শ সেখানে শেখানো হচ্ছে না। ফলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে মানুষ বের হচ্ছে।

আলাহ সেই সঠিক ইসলাম যা জঙ্গিবাদসহ ধর্মের নামে চলা যাবতীয় বিকৃতিকে অপনোদন করতে সক্ষম তা দয়া করে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। সেই যুক্তি তথ্য প্রমাণগুলো উপস্থাপন করে যদি এই জাতির ষোল কোটি মানুষকে সচেতন করে তোলা যায় তাহলে জঙ্গিবাদের

দেশকে রক্ষা করতে জনগণের কর্তব্য

মসীহ উর রহমান
আমীর, হেযবুত তওহীদ

সমস্যা যখন চিহ্নিত:

হাজারো সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের মূল সমস্যা কোনটি তা চিহ্নিত করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন আমাদের জাতির কর্ণধারগণ। সেটা এখন নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হয়েছে। তা হচ্ছে বাংলাদেশ দ্রুত সিরিয়া-ইরাকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছে সেদিকে ধাবমান হচ্ছে। এটি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গত ৮ নভেম্বর একটি সংবাদ সম্মেলনে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন।

এই কথাটি আমরা হেযবুত তওহীদ প্রায় দেড় বছর আগে থেকেই পত্রিকা, সেমিনার, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে, বই, প্রচারপত্র ইত্যাদি নানাভাবে জাতির সামনে এবং জাতির পরিচালকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। যাহোক, মূল সমস্যাটি যখন চিহ্নিত হয়ে গেছে তখন এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করাই পরবর্তী কাজ।

আন্তর্জাতিক মহাসংকট ও তার প্রভাব

বিশ্ব পরিস্থিতি ভীষণ টালমাটাল। ভৌগোলিকভাবে শত শত বিভক্তি ছাড়াও বাদ-মতবাদ, সংঘ, চুক্তি ইত্যাদি নিয়ে বিশ্ব আরো বহু ভাগে বিভক্ত। সংঘাত যুদ্ধ রক্তপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই চলছে। আমেরিকা রাশিয়ার স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে দীর্ঘকাল। আফগান যুদ্ধের পরে রাশিয়া ভেঙে গিয়ে পুঁজিবাদী আমেরিকা বিশ্বের একক নেতৃত্বে চলে আসে। এরপর থেকেই পশ্চিমা সমাজ প্রতিপক্ষ হিসাবে টার্গেট করে ইসলামকে, কারণ গণতন্ত্রের বিপরীতে একমাত্র মুসলিমদের কাছেই একটি জীবনব্যবস্থা আছে যা দিয়ে সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা যায়। আরেকটি কারণ এই ওসিলায় আরব বিশ্বের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তেল যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অচল, সে সম্পদগুলো কুক্ষিগত করা। এই পশ্চিমা সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতার দ্বান্দ্বিক অবস্থানকেই ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশান বলে সমাজবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন।

কয়েক শতাব্দী থেকে পশ্চিমা সভ্যতা দুনিয়ার উপরে ছড়ি ঘোরানোর পর এখন প্রকৃতির নিয়মেই পচনের পর পতনের কাল উপস্থিত হয়েছে। বিশ্ব একটি নতুন সভ্যতা চাচ্ছে। মুসলিমরা সেই অভাব পূরণে এগিয়ে যেতে চাইছে। মুসলমানরা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী নির্যাতন ও দাসত্ব ভোগ করার পর একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি হিসাবে পাশ্চাত্যের জন্য আতঙ্কের কারণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিমদের একটি চরমপন্থী গোষ্ঠী আফগান যুদ্ধের পর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে সংগঠিত হতে থাকে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে তাদের শক্তিশালী সংগঠনে রূপ নিতে বেশি সময় লাগে না। কিছু দল পশ্চিমাদের অনুকরণে রাজনীতিকভাবে, আর কিছু দল সশস্ত্র বিপব ঘটিয়ে। আফ্রিকা থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত যেখানেই মুসলিম আছে সেখানেই বিভিন্ন নামে জঙ্গি দল গঠিত হলো। আল কায়দা, তালেবান, আল-শাবাব, বোকো হারাম, সাম্প্রতিক আইএস প্রভৃত শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় ইতোমধ্যেই দিয়েছে।

এটা সকলেই জানেন যে এই জঙ্গি সংগঠনগুলো মূলত পশ্চিমারাই সৃষ্টি করেছে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার (Tools) হিসাবে। তারাই অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তারাই ধর্মব্যবসায়ীদের ভাড়া করে ওয়াজ নসিহত দ্বারা কথিত জেহাদে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে মুসলিম ধর্মপ্রাণ যুবকদের, যেন তারা সন্ত্রাসী ট্যাগটি সমগ্র মুসলিম জাতির ললাটে এঁকে দিতে পারে। তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ভুল পথে প্রবাহিত করে মুসলিম ও মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে আফগানিস্তান বিরান হয়ে গেল, ইরাকে ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হলো, দেশ ধ্বংস হয়ে গেল, সিরিয়া গণকবরে পরিণত হলো। লিবিয়া রক্তাক্ত জনপদ। এসব দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্য নরককুণ্ড হয়ে আছে, পাকিস্তান পরিণত হয়েছে জঙ্গিদের অভয়ারণ্যে। হায় মানবতা! হায় মুসলমান! এ কী করুণ দুর্দশা তোমাদের কপালে! হতভাগ্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মুসলমান। কেউ আসমানের দিকে তাকিয়ে আছে কবে আসবেন মাহদী (আ.) আর ঈসা (আ.), কেউ এখানে ওখানে বোমা মারছে, কেউ চোখ কান বুজে জিকির করছে, কেউ হজ্ব করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে। আর কেউ এসব মূর্খামি দেখে ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করছে। কেউ এসবের সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তারা পশুর মতো স্বার্থের ঘানি টানছে অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বাকরি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

আফ্রিকায় চলছে নৃশংসতা, রক্তের হোলি খেলা। একেক বিস্ফোরণে একশ দেড়শ লোক মারা যাচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও হামলা হচ্ছে। প্যারিসের মতো উন্নত নিরাপদ শহরে প্রায় দেড়শো মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

প্রতিটি দেশেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফলাফল কি হয়েছে? ফলাফল এই হয়েছে পুরো মুসলিম বিশ্বটা অস্থির হয়ে গেছে এবং জঙ্গিবাদ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতি বা আদর্শ যাদের সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত থাকে তাকে শক্তি দিয়ে দমন করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। স্বার্থের আন্দোলন শক্তির দাপটের কাছে হার মানে কিন্তু ধর্মীয় আদর্শ আরো শক্তিশালী হয়। এ কারণে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ কেরোসিন দিয়ে আগুন নেভানোর মতো ভয়ানক ভুল। এ কারণে বাংলাদেশেও জঙ্গি নেতাদের জেল, ফাঁসি দিয়ে জঙ্গিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে, অন্যান্য দেশেও একই অবস্থা হয়েছে। আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী একপ্রকার পরাজিতই হয়েছে এবং আল কায়েদা, তালেবানের স্থলে বহু শক্তিশালী জঙ্গি সংগঠন আই.এস-এর উত্থান ঘটেছে।

ইসলামী রাজনীতি থেকে জঙ্গিবাদ

যে রাজনীতিক দলগুলো ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সস্তা ভোটব্যাংক অর্জন করতে চায় তারাও ধর্মীয় সুরে কথা বলে, মানুষ তাতে আকৃষ্ট হয়। তাদের নেতৃবৃন্দ জনগণকে দিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে জ্বালাও পোড়াও ধাঁচের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব অস্থিতিশীলতার কারণে সরকারও বিবিধ উন্নয়ন করা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তা হারায়। ধর্মীয় রাজনীতিক দলগুলোর কর্মসূচির দ্বারা দেশ ও জনতার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে, রাস্তাঘাট, যানবাহন, ব্রিজ কালভার্ট ধ্বংস হয়, সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়, আহত হয়, ভোগান্তির শিকার হয়। এগুলোও করা হয় মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে হাইজ্যাক করে ঈমানকে অপব্যবহার করার মাধ্যমে। নিরপরাধ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কোনো কাজ ধর্মে অনুমোদিত হতে পারে না, হত্যা করার তো প্রশ্নই আসে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পুরো জাতিটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, এটা ইতিহাস। কৃষক শ্রমিক জনতাকে বিপবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। তারা অস্ত্র তুলে নিয়েছে দেশ স্বাধীন করেছে। আশাবাদ ছিল জাতিটা শির উঁচু করে দাঁড়াবে। দাঁড়াতো, যদি তারা ঐক্যবদ্ধ থাকতো। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ী আর রাজনীতিবিদদের স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতার মাঝে পড়ে জাতিটি গত ৪৪ বছরে মানসিকভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে যে খণ্ডগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত।

এ দীর্ঘ সময়ে যতগুলো সরকারই এসেছে তারা

বিরোধীপক্ষের শত্রুতার শিকার হয়েছে এবং অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। সরকারের অতি বাড়াবাড়িও অনেক ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বার বার হয়েছে জ্বালাও পোড়াও হরতাল অবরোধ ফলে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। যখন রাষ্ট্রে সামাজিক অপরাধ বা রাজনীতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় তখন জনগণের মধ্যে সরকারকে দোষারোপ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চালের দাম বাড়ছে সরকারের দোষ, রাস্তায় যানজট সরকারের দোষ, টাকা ছিনতাই হয়েছে সরকারের দোষ। এটা সরল সত্য যে রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে এই ব্যর্থতার দায় সরকারের উপরই বর্তায়। সরকারের যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই থাকুক সবই তখন মানুষ ভুলে যায়- এটা দুঃখজনক বাস্তবতা। তবে শেষ কথা হলো, এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি আর পাল্টা-পাল্টি দোষারোপের পর্যায়ে নেই, এখন সিরিয়া-ইরাকে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশও অপ্রতিরোধ্য গতিতে সেই দিকে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে, এমন বিষয় স্বীকার করে নিতে তার ওপর প্রচণ্ড চাপ আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সুতরাং এ কথা উড়িয়ে দিতে হবে এমন মন-মানসিকতা যদি কারো থাকে তাহলে একটি সত্য তার চোখ এড়িয়ে যাবে। আমরা মনে করি এটি তার একটি সাহসী উচ্চারণ এবং তিনি আমাদের জাতীয় সমস্যার মূল জায়গায় আঘাত করেছেন। কিন্তু এর থেকে জাতিকে বাঁচানোর একটাই উপায়। সেটা হলো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আই.জি.পি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলেই বলেছেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। প্রশ্ন হলো, এত হাজার ভাগে বিভক্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ কীসের ভিত্তিতে হবে? একাত্তর সালে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবিতে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এখন কীসের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে, সেই আদর্শটা কী?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতি রক্ষার চেতনা নেই

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিটি যে আদর্শগুলো পাচ্ছে সেগুলোই জাতির চিন্তা চেতনাকে নির্মাণ করছে। পাশাপাশি আছে রাজনীতিক, ধর্মীয় নানাগোষ্ঠীর প্রচার প্রচারণা, আছে পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। মাদ্রাসা থেকে বের হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ছাত্র যারা ইসলামকে জীবিকা হিসাবে ব্যবহার করা শিখছে। তারা 'ইসলাম' নয় বড়জোর বলা যায় তারা 'আরবি ভাষা' শিখে আত্মম্ভরিতায় ফুলে উঠছে। তাদের কাছে দেশপ্রেমের কোনো গুরুত্ব নেই, তারা দেশরক্ষার জন্য ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিতও নয় ব্যতিক্রম দুই-চার জন আছে। অনেকে বলে মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি সৃষ্টি হয়, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ জঙ্গি হতে হলে সাহস লাগে আর মাদ্রাসা শিক্ষা একটি সিংহকেও শিয়াল বানিয়ে দেয়। জঙ্গিবাদের শিক্ষা এদেশে নয়, বিদেশ থেকেই আসছে, মাদ্রাসার ধর্মান্ধরা সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয় সহজে এটা বলা যেতে পারে। কওমী মাদ্রাসা আলীয়া মাদ্রাসাকে ইসলাম বলে স্বীকার করে না, আর আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা কওমীদেরকে গোঁড়াপন্থী বলে গালি দেয়। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেও আছে বহু বিভক্তি।

আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগুলো অধিকাংশই হয়েছেন বৈষয়িক স্বার্থকেন্দ্রিক। নিজেদের ক্যারিয়ার, উপার্জন, ভালো চাকরি, গাড়ি-বাড়ি, আরাম-আয়েশের উৎকর্ষকেই তারা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বলে বিশ্বাস করেন। দেশ-সমাজ-জাতি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, বড় জোর কেউ কেউ সুশীল সাজতে জাতীয় সমস্যা নিয়ে সৌখিন বাক্যালাপ করে থাকেন। এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বের হচ্ছেন সেই ব্রিটিশ আমলের কেরানি শিক্ষায় শিক্ষিতরা। প্রতিবছর প্রভুদের দেখাদেখি কিছু পরিবর্তন আনা হয় এবং ভিত্তিও রয়ে গেছে সেখানেই যেখানে প্রভুরা রেখেছিল। সেটা হচ্ছে পড়াশেনার উদ্দেশ্য একটা চাকরি যোগাড় করা, একটা আমলা হওয়া নিজের বাড়ি গাড়ি করা কিন্তু জাতি দেশ সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার কিছু করার নেই। তাদের চিত্তের কেবলা আমেরিকা ইউরোপ, সেখানে তারা টাকা জমায়, স্বপ্ন দেখে সেখানে সপরিবারে বাস করার। এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে আসলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় না, এটি ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষা তার জন্য বেশি কথা বলা লাগে না কারণ ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। এই শিক্ষা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে শিক্ষা দেয় না। তাই প্রয়োজন হচ্ছে বিকল্প আদর্শ।

আমাদের দেশটাকে কীভাবে আন্তর্জাতিক সংকটের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে তা অনেকেই বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন। যদি তেমনটা হয়েই যায় সরকার কী করবে? আজ যে একটার পর একটা হত্যাকাণ্ড চলছে সেটা কি সরকার ফেরাতে পারছে? এখন লেখক, সাংবাদিক, বগার, পুলিশ, আর্মি, কারাগার রক্ষী সবার উপর হামলা শুরু হয়েছে।

জাতিকে রক্ষার উপায়:

এ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমরা যেমন নির্বিকার হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছি, সকালে উঠে স্কুল কলেজে, চাকরিতে ছুটছি, আবার বাসায় ফিরে টিভি দেখতে বসছি, আড্ডাবাজি করছি, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছি যেন জাতি রক্ষায় আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই। এভাবে চলতে থাকলে পতন এড়ানো যাবে না। এখন জনগণকে জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেটা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং তাদের সামাজিক দায়িত্ব। সেটা কীভাবে তা আমরা হেযবুত

জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

-হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, এমাম, হেযবুত তওহীদ

[গত ১৯ নভেম্বর দৈনিক বজ্রশক্তির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আয়োজিত 'সন্ত্রাস দমনে জনসম্পৃক্ততার বিকল্প নেই' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে হেযবুত তওহীদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।]

সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকে এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জাতি আজ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। দেশ-বিদেশের চক্রান্তকারী সাম্রাজ্যবাদীদের টার্গেটে পড়েছে এই ভূ-খণ্ড। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে দেশকে বাঁচাতে চাইলে তাই সাধারণ মানুষের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। যখন সাম্রাজ্যবাদীরা কোনো দেশকে লক্ষ্যবস্তু বানায় সে দেশের সাধারণ জনগণকেই তার মূল্য দিতে হয়। ইরাকে দশ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আফগানিস্তানকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিরিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে সাগরে ভাসছে, বিভিন্ন দেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। মারা গেছে কয়েক লক্ষ। এসব দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্তত নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদ থেকে হলেও এখন নিশ্চুপ থাকার উপায় নেই। ঐ সব দেশের জনগণ ভেবেছিল সরকার সব কিছু সামাল দেবে, কিন্তু

সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র আর জঙ্গিবাদের উত্থানের ফলে যে দুর্যোগ তাদের দেশগুলোতে নেমে এসেছিল তা সরকারের একার পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমাদের দেশের সরকারের পক্ষেও সম্ভব হবে না। এজন্য আমাদের দেশের চিন্তাশীল মানুষ, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করছেন। আমাদের রাজনীতিকরা দেশপ্রেমের কথা বলেন কিন্তু তারা অনেকেই বিদেশে সেকেন্ড হোম কিনে রেখেছেন। তেমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের, এই ১৬ কোটি মানুষের কোনো সেকেন্ড হোম নেই। আমাদেরকে হয় এখনই ঐক্যবদ্ধভাবে অপশক্তির মোকাবেলা করতে হবে, নয়তো বোমার আঘাতে ছিন্ন হতে হবে।

হেযবুত তওহীদ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সকলে এগিয়ে আসুন। আমাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে এই দেশের এক ইঞ্চি জমিতেও আমরা অশান্তি হতে দেব না।

আমাদের দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটানো জন্য গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এর প্রতিকার করতে সরকার কী করবে? তাদের কাছে আইন আছে, আরো কড়া আইন তৈরি করবে, গ্রেফতার করবে, পিটিয়ে রাজপথ থেকে বিদায় করবে, কিন্তু তারা আকাশেও উড়ে যাবে না, জমিনেও মিশে যাবে না। তারা ষোল কোটি মানুষের সঙ্গে মিশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। মানুষের ঈমানকে ধ্বংসাত্মক পথে চালিত করবে। জঙ্গিবাদকে শক্তি প্রয়োগে কোথাও দমন করা যায় নি, বরং এতে আরো তা বিস্তার লাভ করছে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সামরিক শক্তিতে আমাদের দেশের চাইতে অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তারা জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে কার্যত ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এই সেদিনও ফ্রান্সে হামলা করে প্রায় দেড়শ মানুষকে হত্যা করল জঙ্গিরা। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তিতে অনন্য হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স আজ জঙ্গিবাদের মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। তাদের সরকার আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করছে সিরিয়ার সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে। জঙ্গিদের অপকর্মের খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। এভাবে জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে? মনে রাখতে হবে, মতবাদভিত্তিক সন্ত্রাসকে বুলেট-বোমা দিয়ে নিঃশেষ করা যায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলিটিক্যাল ইসলামের উত্থানকে শক্তি প্রয়োগ করে রুদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে জঙ্গিবাদের দিকে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, এদের সকল চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের বিকৃত আদর্শ ও কথিত জেহাদী চেতনা। একমাত্র তাদেরকে যদি আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করা যায়, এ সত্যকে তাদের সামনে উপস্থাপন করা যায় যে, তারা যেটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে সেটা প্রকৃত ইসলাম নয় এবং যে পথে সংগ্রাম করছে সেটা ইসলামসম্মত পথ নয় তবেই মানুষ জঙ্গিবাদের পথ থেকে ফিরতে পারে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কোর'আন-হাদীসভিত্তিক আদর্শিক মোকাবেলা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের দিয়ে হবে না। মাদ্রাসা থেকে ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি হয় কিন্তু ধর্ম কি সেই জ্ঞান দেওয়া হয় না। ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা আসলে ব্যক্তিগত জীবনের খুটিনাটি মাসলা মাসায়েল দোয়া কালাম দিয়ে পূর্ণ, ধর্ম কর্ম করে খাওয়া ছাড়া সেখান থেকে আর কিছুই শেখা যায় না। কিছুদিন থেকে বিতর্ক চলছে- বাংলাদেশে আইএস আছে কি নেই। আইএস-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে আমাদের এখানেও আইএস-দমনের নাম করে পশ্চিমারা আসবে। বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। তাই এখন আর জনগণের নির্বিকার থাকা যাবে না।

জনগণ আজ বিভিন্ন চেতনা আর ইজমে বহুধাবিভক্ত। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে শক্তিশালী আদর্শ লাগবে। একাত্তরের মতো দেশপ্রেমের চেতনা লাগবে। আর যেহেতু ধর্মবিশ্বাস দ্বারা সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাই ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই এর সমাধান করতে হবে। শুধু মৌখিক আহ্বান দিয়ে হবে না। এখন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে তার জীবনের সার্থকতা কিসে তাহলে সে নিজের জীবন সার্থক করার জন্য তৎপর হবে। সে বুঝবে যে অন্যের কল্যাণ করার জন্যই তার জন্ম, তার জীবন। মানুষকে বোঝাতে হবে যে কেন সে দেশের